ত্রিপুরাপাড়ার আদিবাসী এবং বিপন্ন বসতি

লিখেছেন **মোঃ আরাফাতুল ইসলাম**
ত্রিপুরাপাড়া, চট্টগ্রাম থেকে ফিরে

ছোট কুমিরা! চট্টগ্রাম বিভাগের অন্তর্ভুক্ত একটি এলাকা। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশে অবস্থিত হলেও উন্নয়নের তেমন একটা ছোঁয়া লাগেনি। বরং বড় বড় কল-কারখানার বিষাক্ত ধোঁয়া দূষিত করে দিচ্ছে এর পরিবেশ। ছোট কুমিরার দুর্গম পাহাড়ি এলাকায় বেশ কিছু আদিবাসী বসবাস করে। ভূমিহীন এসব আদিবাসী নাগরিক সুযোগ-সুবিধা থেকে যেমন বঞ্চিত, তেমনি বঞ্চিত আইনি নিরাপত্তা থেকেও। এমনই সুবিধাবঞ্চিত একটি গ্রাম ত্রিপুরাপাড়া। ত্রিপুরা বংশোদ্ভূত ৮০টি আদিবাসী পরিবার রয়েছে সেখানে। ত্রিপুরাপাড়ার মোট জনসংখ্যা ৪৫০ জন, যার মধ্যে ১৩০ জনের মতো শিশু রয়েছে। ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক থেকে প্রায় ৩ কিলোমিটার এবড়ো-খেবড়ো পাহাড়ি পথ পেরিয়ে যেতে হয় ত্রিপুরাপাড়ায়। আর সেখানে যাবার জন্য বাহন শুধু পদযুগল।

ভূমিহীন আদিবাসী

ত্রিপুরাপাড়ার জন্ম প্রায় ১০০ বছর আগে। সেসময় এই জমির মালিককে প্রতি বছর ভাড়া দিতে হবে - এমন চুক্তিতে থাকতে দেয় কয়েকজন ত্রিপুরা নাগরিককে। সেই থেকে শুরু ত্রিপুরাপাড়ার। বর্তমানের অবস্থা সম্পর্কে পাড়ার সর্দার কর্ন ত্রিপুরা বলেন, 'আমরা প্রতি বছর এই জমির জন্য ৫ হাজার টাকা দেই। এছাড়া আমরা জুম চাষ করি। সেখানে বিভিন্ন মৌসুমি সবজির আবাদ হয়। আমাদের উৎপাদিত ফসল থেকেও তাদেরকে হিস্যা দিতে হয়। সব মিলিয়ে জমির মালিক আমাদের কাছ থেকে প্রতি বছর দেড় থেকে দুই লাখ টাকা নেয়।'

ত্রিপুরাপাড়া আমাদের দেশের ভেতরেই অবস্থিত। সরকারি হিসেব অনুযায়ী এই এলাকার আদিবাসীরাও এখন বাংলাদেশী নাগরিক। কিন্তু তাদের দীর্ঘদিনের জমির দাবি নিয়ে সরকারের কোনো মাথাব্যথা নেই। এ বিষয়ে ত্রিপুরাপাড়ার স্কুলশিক্ষক রবীন্দ্র ত্রিপুরা বলেন, 'নিজস্ব জমি না থাকায় আমরা তেমন কোনো সরকারি সাহায্য পাই না। চেয়ারম্যানের কাছে গেলে বলে তোমাদের তো জমিই নেই, সুবিধা দিয়ে লাভ কি? জমির জন্য আমরা অনেক আগে থেকে টিএনও, চেয়ারম্যানদের কাছে গিয়েছি- এমনকি এমপি এলকে সিদ্দিকীর কাছেও গিয়েছি। কিন্তু কাজের কাজ কিছুই হয়নি। তবে শুনেছি, আমাদের থাকার জন্য স্থায়ী জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু এমপি এলকে সিদ্দিকী জমি সংক্রান্ত কাগজপত্রে সই না করায় সেই জায়গা আমরা পাইনি। তিনি কি কারণে কাগজে সই করেননি তা আমরা জানি না।'

কষ্টের স্কুল

ত্রিপুরাপাড়ায় আছে একটি ছোট্ট বিদ্যালয়। এখন থেকে প্রায় তেরো বছর আগে ওয়ার্ল্ড ভিশন নামক একটি এনজিও প্রতিষ্ঠা করে এটি। প্রজেক্টের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলে চলে যায় ওয়ার্ল্ড ভিশন। পরবর্তীকালে এখন থেকে তিন বছর আগে স্কুলটির দায়িত্ব নেয় স্থানীয় এনজিও ইপসা। সরেজমিনে গিয়ে দেখা গেল, কোনো রকমে টিকে আছে বিদ্যালয়টি। এখানে শিক্ষা দেবার জন্য ভালো কোনো শিক্ষকও নেই। পাড়ার ছেলে রবীন্দ্র এই বিদ্যালয়ে শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন। এই স্কুল সম্পর্কে কর্ন বলেন, 'আমরা বহু কষ্টে ধরে রেখেছি এই স্কুলটি। কিন্তু সমতল থেকে শিক্ষক আনার মতো টাকা-পয়সা তো আমাদের নেই। সরকার সহায়তা করলে স্কুলটি আরো ভালো করা যেত।' স্কুলের শিক্ষক রবীন্দ্র জানান, 'আমরা এখানে তেমন কোনো উন্নত

আদিবাসীদের হাতে আঁকা ত্রিপুরাপাড়ার মানচিত্র

শিক্ষা দেই না। মূলত ছোট ছেলেমেয়েদের স্কুলে যাবার উপযোগী শিক্ষা দেয়া হয়। এখানে ক্লাস টু পর্যন্ত পড়ানো হয়।'

খোঁজ নিয়ে জানা যায়, এখানকার শিশুরা রাস্তাঘাটের অভাবে ঠিকমতো সমতলের স্কুলে যেতে পারে না। তার ওপর বেশির ভাগ ছেলেমেয়ের স্কুলের ভরণপোষণের খরচ যোগাতে পারে না আদিবাসীরা। আর এ কারণেই ১৩০ জন শিশুর মধ্যে মাত্র ১২-১৩ জন সমতলের স্কুলে যাবার সুযোগ পায়। বাকিরা অ, আ, ক, খ পড়েই লেখাপড়া জীবন শেষ করে। তারপর একটু বড় হলে বাবার হাত ধরে জুম চাষে মনোযোগী হয়। এই পল্লীতে শিক্ষক রবীন্দ্রই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দশম শ্রেণী পর্যন্ত পড়তে পেরেছিলেন।

বৈষম্য

আদিবাসীরাও বাংলাদেশী। তবে এ কথা মুখে বললেও কাজে মানতে রাজি নয় সমতলের বাসিন্দারা। যে কারণে আদিবাসীদের চাষ করা ফসল আর সমতলের বাসিন্দাদের ফসলের দামে থাকে ঢের ব্যবধান। এ বিষয়ে কর্ন জানান, 'আমাদের মতো অনেক সমতলের বাঙালিও চাষবাস করেন। কিন্তু একই ফলন সমতলের বাসিন্দারা কেজি প্রতি ১৫ টাকায় বিক্রি করলে আমরা সেখানে বিক্রি করতে পারি ৮ থেকে ৯ টাকায়। অথচ সমতলের বাসিন্দাদের চেয়ে আমাদের খাটতে হয় অনেক বেশি। আমরা আদিবাসী বলে আমাদের এভাবে ঠকায়।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আদিবাসীরা এক বোঝা বাঁশ বা এক ঝুড়ি মাল নিয়ে বাজারে যাবার পথে জায়গায় জায়গায় তাদের চাঁদা দিতে হয়। এই চাঁদার পরিমাণ ঝুড়ি প্রতি পাঁচ টাকা।

পুলিশ কিংবা র‍্যাবের আওতামুক্ত!

'আমাদের এখানে কখনো র‍্যাব আসেনি। পুলিশও শেষ কবে এসেছে মনে নেই। আমরা সমস্যায় পড়লে পুলিশের কাছে যাই। তখন তারা বলে এতোদূরে গিয়ে তো আর আসামি ধরা যাবে না। শুধু শুধু গিয়ে লাভ কি? তারা বোঝার চেষ্টা করে না আমরা কতটা নিরাপত্তাহীনতার মাঝে জীবন কাটাই।' একবুক কষ্ট নিয়ে কথাগুলো বলেন ত্রিপুরা পাড়ার বৃদ্ধ অধিবাসী পুংখ রাই।

আকাশ সংস্কৃতি থেকে অনেক `রে তাদের জীবন। তাই অবসরে বিনোদনের ব্যবস্থাটা নিজেরাই করে নেন

পুলিশ বা র‍্যাব না থাকলেও আদিবাসীদের এলাকায় যাবার পথে রয়েছে চেকপোস্ট। মাথায় বোঝা নিয়ে এই চেকপোস্ট পার হবার সময় চাঁদা আদায় করা হয় আদিবাসীদের কাছ থেকে। আর বাঙালি কেউ আদিবাসী এলাকায় যেতে চাইলে কারণ জানাতে হয় চেকপোস্টে বসে থাকা লোকদের। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এরা পাহাড়ের মালিকের লোক। আদিবাসীদের তথা পাহাড়ী এলাকার নিরাপত্তার (?) জন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু রক্ষক যখন ভক্ষকের ভূমিকায় থাকে তখন বাঁচাবার সাধ্যি কার!

নাগরিক অধিকার

একসময় এখানকার আদিবাসীদের কষ্ট করে ভোট দিতে যেতে হতো না। অন্যরাই তাদের নামে ভোটগুলো দিয়ে দিতো। কিন্তু বর্তমানে বিভিন্ন এনজিওর সহায়তায় এবং নিজস্ব চেষ্টা-তদবিরে কিছু কিছু নাগরিকসেবা পাচ্ছে ত্রিপুরাপাড়ার বাসিন্দারা। তাদের এই সেবার তালিকায় রয়েছে ভোটার অধিকার, ভিজিএফ কার্ড, বৃদ্ধ ভাতা ইত্যাদি। এ বিষয়ে কর্ন জানান, 'আমরা এখন ভোট দিতে পারি। তবে ভোট দেবার আগে প্রার্থীরা আমাদের অনেক ওয়াদা করে যান। আর ভোট হয়ে গেলে তাদের দেখা পাওয়াও ভাগ্যের ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া গ্রামের কয়েকজন বৃদ্ধভাতা ও ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে প্রতি বছর গম পায়।'

ত্রিপুরাপাড়ায় পানির অভাব প্রকট। পাড়া থেকে কিছু দূরে একটি ডিপ টিউবওয়েল ছিলো। কিন্তু এটিও বেশ কয়েক দিন ধরে নষ্ট হয়ে আছে। টিউবওয়েলটি ঠিক করারও কোনো উদ্যোগ নেই সংশ্লিষ্টদের। ফলে পাহাড়ি ঝরনার পানিই ভরসা আদিবাসীদের। 'আমাদের এখানে বিশুদ্ধ পানির তীব্র সংকট। পাহাড়ের ভেতরের কিছু পানি আর বৃষ্টির সময় জমিয়ে রাখা পানিই আমাদের একমাত্র ভরসা'- জানান পুংখ রাই ত্রিপুরা।

আদিবাসী পল্লীতে চিকিৎসারও কোনো সুব্যবস্থা নেই। স্থানীয় একটি এনজিও প্রতি মাসে একবার স্যাটেলাইট ক্লিনিক বসায় এখানে। কিন্তু এই স্যাটেলাইট ক্লিনিক থেকে জন্মনিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা কিংবা এ সংক্রান্ত কোনো পণ্য পাওয়া যায় না। তাই আদিবাসী পল্লীতে জন্মনিয়ন্ত্রণের কোনো বালাই নেই। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, একেকটি পরিবার পাঁচ থেকে ছয়টি করে শিশু জন্ম দেয়। আর এসব শিশুর রোগ বালাইয়েরও কোনো কমতি নেই। এ বিষয়ে কর্ন জানান, 'আমরা নামেই বাংলাদেশের নাগরিক। চিকিৎসার অভাবে এখানে অনেকেই মারা যায়। চিকিৎসাসেবা জনগণের অধিকার হলেও আমরা তার ছিটেফোঁটাও পাই না।'

এরকম হাজারো সমস্যায় ভুগছে ত্রিপুরা পল্লীর আদিবাসীরা। 'আমরা এখন আর কারো ওপর ভরসা করতে পারি না। সত্য কথা যে আমাদের জন্য রয়েছে বিপদ। তাছাড়া আমরা তো দুর্বল, আমাদের পক্ষে কথা বলার মতোও কেউ নেই'- ক্ষোভের সঙ্গে বলেন আদিবাসী পল্লীর কয়েকজন।

আদিবাসীদের এই কষ্টের বিষয়গুলো সরকারি মহল কি আসলেই অবগত নন?

ছবি : **লেখক**

ত্রিপুরার একমাত্র স্কুল, ত্রিপুরাবাসীর মতোই অবহেলিত